ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 502-510
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.236

ব্যাঘ্র প্রকল্প ও অরণ্যভূমিপুত্রদের জীবনকথা: অরণ্য ও শিকারকেন্দ্রিক বাংলা কথাসাহিত্য অবলম্বনে একটি পর্যালোচনা

পূজা ভুঁঞে, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস, উত্তরপ্রদেশ, ভারত*

Received: 20.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the present article, the lived realities of life and livelihood of forest-dwelling communities are analysed in the context of the 'Tiger Project', drawing upon Bengali forest and hunting-centred fiction. While state-driven wildlife conservation policies have accorded significant importance to forest preservation and the increase of the tiger population, the life security, livelihood, and rights of forest-dependent working people have remained comparatively neglected. This inherent contradiction is brought to light through close readings of selected literary texts. In Bengali fiction, the 'Tiger Project' is represented at times as a symbol of conservation, and at other times as an experience of fear, uncertainty, and deprivation for forest-dwelling communities. The terror of man-eating tigers, restrictions on forest use, crises surrounding compensation and rehabilitation, and the silenced voices of marginalised people— these issues are transformed into humanistic and ethical questions through literary narratives. This review includes forest and hunting-centred narratives by Deviprasad Bandyopadhyay, Shibshankar Mitra, Buddhadeb Guha, and Chandranath Chattopadhyay. Consequently, the objective of the present article is to examine the literary representation of the lived realities, psychological tensions, and conflicts of forest-dwelling people with forest policies, as portrayed in selected Bengali forest and hunting-centred fiction centred on the Tiger Project.

Keywords: Environmental Consciousness, Forest and Hunting-Centric Bengali Fiction, Forest Policy, Forest-Based Working Communities, Indigenous Forest Dwellers, Tiger Project, Wildlife Conservation

অরণ্য ও শিকারকেন্দ্রিক বাংলা কথাসাহিত্য দীর্ঘদিন ধরেই প্রকৃতি ও মানব সম্পর্ককে উন্মোচিত করে এসেছে। এই সাহিত্যধারায় অরণ্য কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পটভূমি না হয়ে সরাসরি মানব সভ্যতা কর্তৃক প্রকৃতির ধ্বংসলীলার প্রতিচ্ছবি উন্মোচিত করে, সেইসঙ্গে প্রকৃতি সচেতনতার বার্তা দেয়। ঔপনিবেশিক সময় থেকে উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্ব পর্যন্ত অরণ্যকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, শিকারনীতি ও সংরক্ষণমূলক উদ্যোগ সাহিত্যের ভাষায় নানা রূপে, নানাভাবে প্রতিফলিত হয়ে এসেছে। এই পর্যায়ে স্বাধীন ভারতবর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ 'বাঘ প্রকল্প'। বাঘ সংরক্ষণ উদ্যোগ বাংলা সাহিত্যের অরণ্য ও শিকারকেন্দ্রিক কাহিনিগুলোকে প্রভাবিত করেছে। এই প্রকল্প মূলত বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী রক্ষার একটি পরিবেশবান্ধব

উদ্যোগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও, অরণ্যকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে এর প্রতিফলন ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে, যেখানে অরণ্য-অধিবাসী ও এই প্রকল্পের বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। যার বিশ্লেষণে উঠে আসে বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প অরণ্য ভূমিপুত্র অধিবাসীদের জীবনে জন্ম দিয়েছে ভয়, অনিশ্চয়তা ও জীবিকাগত সংকট। অন্যদিকে, পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলত বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল অরণ্য ও শিকারকেন্দ্রিক নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে বাঘ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে অরণ্যঅধিবাসী মানুষের জীবনবাস্তবতা, মানসিক টানাপোড়েন ও রাষ্ট্রীয় বননীতির সঙ্গে তাদের সংঘাতের সাহিত্যিক রূপ বিশ্লেষণ করা।

ভারতীয় বাঘ প্রকল্প এমন একটি পরিবেশগত বিপ্লব, যা বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত নৈতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ভারতীয় অরণ্যে ও সেইসঙ্গে জাতীয় স্তরে বাঘের সংখ্যা অত্যাধিক কমে গিয়ে বিপন্নতার মুখে পড়লে ১৯৭৩ সালে ভারত সরকার 'Tiger Project' বা বাঘ প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হল বাঘের সংখ্যা পুনরুদ্ধার করা, তার বাসস্থান রক্ষা করা, এবং সেইসঙ্গে অরণ্য ও এর পরিবেশগত মূল্যকে একটি জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে সংরক্ষণ করা। বর্তমানে এই উদ্যোগ আঠারোটি রাজ্যে প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি 'টাইগার রিজার্ভ'-এ বিস্তৃত হয়ে, প্রায় পঁচাত্তর হাজার (৭৫,০০০) বর্গকিলোমিটার বনাঞ্চল জুড়ে কাজ করছে— যা ভারতের মোট ভূ-ক্ষেত্রের প্রায় দুই দশমিক দুই (২.২) শতাংশ।[১] এই প্রকল্পকে বাস্তবায়নের জন্য গঠন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার বন-পরিবেশ মন্ত্রকের অধীনে 'National Tiger Conservation Authority' (NTCA)। যা নীতি নির্ধারণ, তহবিল পরিচালনা এবং প্রতিটি রিজার্ভে ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক কাজ তদারকি করে।[২] প্রকৃতির চোখে বাঘ হল 'Umbrella Species' অর্থাৎ এটি শুধু নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় নয়, বরং তার সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য প্রাণী ও 'ইকোসিস্টেম' তথা বাস্তুতন্ত্র-এর ভারসাম্যও ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলত বাঘের সংরক্ষণ মানে পশুপাখির খাদ্যশৃঙ্খলা, বৃক্ষ, জলাশয়, মাটি এবং অন্যান্য জীবের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।[৩]

বস্তুত, 'বাঘ প্রকল্প'-এর বাস্তব কার্যক্রমগুলো যথেষ্ট বিস্তৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ। এটি কেবল বনাঞ্চলকে 'রিজার্ভ' হিসেবে ঘোষণা করেই থেমে থাকেনি, সেইসঙ্গে তৎকালীন উগ্র ও অনৈতিক শিকারিদের বিরোধিতা করেছে, বিশেষ করে অবৈধ শিকার তথা চোরা শিকার বন্ধ করতে এই পদক্ষেপ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বাঘদের নিকটবর্তী এলাকা থেকে মানুষের বসবাস সরিয়ে নেওয়া, বনকর্মী ও সুরক্ষার কৌশল শক্তিশালী করে গড়ে তোলা, বনাঞ্চলের জল সংস্কার, পশুপক্ষীর প্রজনন ও খাদ্যশৃঙ্খলার উন্নয়ন, মানচিত্র ও উন্নত টেকনোলজি ব্যবহার করে সেই সমস্ত এলাকায় স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্যকলাপ পরিবেশের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। এমনকি বিভিন্ন রিজার্ভে 'Anti-poaching squads' বা চোরা শিকার বিরোধী বিশেষ দল তৈরি করা হয়েছে, যাদের কাজ অবৈধ শিকার, পাচার ও বনদস্যুতার বিরুদ্ধে লড়াই করা। এই পদক্ষেপ বাঘকে রক্ষা করার পাশাপাশি বনাঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থানীয় জীববৈচিত্র্যকে শক্তিশালী করে।

দুই

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অবিশ্বাস্য অভিযান' গ্রন্থে বিখ্যাত মানব দরদি শিকারি জিম করবেটের শিকার জীবনাংশের খানিকটা তুলে ধরা হয়েছে। জিম করবেটের বাল্যকালীন প্রকৃতিনির্ভর জীবনচিত্রের কথা বলতে গিয়ে সেই সময়ের পর্যাপ্ত বাঘের উপস্থিতির কথা উঠে এসেছে উল্লেখিত গ্রন্থে।

> "তিনি বাঘের প্রতি আগ্রহশীল হয়েছিলেন সেই তখন থেকে, যখন তাঁকে এমন একটা অঞ্চলে সেই শিশুকাল থেকে বসবাস করতে হয়েছিল, যেখানে বাঘ ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং তাদের হালচাল লক্ষ্য করবার মতো সময়েরও অভাব ছিল না।"[৪]

উল্লেখিত শিকারিকে মানব দরদি শিকারি বলার কারণ তৎকালীন সময়ে বাঘের সংখ্যা পর্যাপ্ত থাকায় বাঘ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তখনও বিশেষভাবে অনুভূত হয়নি। সেই বাস্তবতায় রাষ্ট্র ও প্রশাসনের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মূলত মানুষখেকো বাঘের কবল থেকে গ্রামীণ দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জীবনরক্ষার দিকে। সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি বদলেছে। বাঘের সংখ্যা ভয়াবহভাবে হ্রাস পাওয়ায় সংরক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বন্যপ্রাণীরা বনে থাকলেই সুন্দর— যদিও বাস্তবে সেই বন মানুষের হস্তক্ষেপে ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। ফলে আজ বন্যপ্রাণীরাও তাদের নিজস্ব আবাসভূমি হারিয়ে কার্যত উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে, যা মানবসভ্যতার নৈতিক সংকটকে উন্মোচিত করে।[৫] যাইহোক, কেবল বাঘই নয়, অবিভক্ত ভারতবর্ষে অন্যান্য পশু-পাখির সংখ্যাও ছিল বিপুল।[৬] কালাগড় জঙ্গলের সমৃদ্ধ পশু-পাখি সম্পর্কে বলা হয়েছে-

> "কালাগর বাংলো থেকে জঙ্গলের রাস্তাটা পাইন, ওক এবং রডোডেনড্রন্ গাছের খুব সুন্দর বনের ভেতর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। কুমায়ূনের অন্য বনের তুলনায় এই বনে অনেক বেশি শিকার পাওয়া যায়। সম্বর, হরিণ, কাকর ও শুয়োর প্রচুর পরিমাণে বাস করতো। সে তুলনায় পাখীর সংখ্যাই কিন্তু বেশি।"[৭]

সুন্দরবন পটভূমিকে কেন্দ্র করে রচিত 'সুন্দরবন আতঙ্ক' উপন্যাসে, সুন্দরবনের 'আতঙ্ক' বলতে এখানকার বাঘ তথা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে, একসময় অসংখ্য সুন্দরী গাছ থাকার জন্য এই বনাঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছিল সুন্দরবন। কিন্তু কথক যে সময়ে সুন্দরবনে অবস্থান করছেন তখন কিন্তু সুন্দরী গাছ অস্তিত্ব সংকটের পথে বিচরণ করছে। সুন্দরবনের সেই সৌন্দর্য আর নেই। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল বনে; অন্যদিকে মানুষ কেবল বন্যপ্রাণীই নয়, নির্বিচারে ধ্বংস করেছে তাদের আবাস্থল বনভূমিও। এই প্রসঙ্গে কাহিনিতে পাওয়া যায়-

> "সমুদ্র উপকূলবর্তী পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে বনজ সম্পদ বলতে বিশেষ কিছু নেই। এই অঞ্চলে নতুন করে আর গোলপাতার চাষ হয় না, আগেকার দিনে ঘর ছাওয়ার কাজে গোলপাতার ব্যবহার হত। ইদানীং কদাচিৎ চোখে পড়বে গোলপাতার বাহার— ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এখানে-ওখানে।"[৮]

এইভাবে বন ধ্বংসের ফলে বাঘ তার আবাসভূমি ছেড়ে লোকালয় মুখী হয়। বনে স্বাভাবিক খাদ্য না পেয়ে অথবা মানুষের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত (বয়স জনিত কারণেও) হয়ে নরখাদকে পরিণত হয়।

সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশের সংকটময় পরিস্থিতি ও তার থেকে পরিত্রাণের উপায়ের কথা বলেছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোক্ত উপন্যাসে। লেখকের সেই বক্তব্যের ভাবান্তর এরূপ- সুন্দরবন একদিকে যেমন ভয়াবহ ও অরণ্যঘেরা বন্য প্রকৃতির প্রতীক, অন্যদিকে তেমনি তার সৌন্দর্য সীমাহীন ও আকর্ষণীয়। এই কঠোর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই মানুষের অবসর ও মানসিক প্রশান্তির জন্য গড়ে উঠেছে পাখিদের সংরক্ষিত আবাস— পাখিরালয়। এটি সজনেখালি বনদপ্তরের কাছাকাছি অবস্থিত এবং এখানে বিরল প্রজাতির পাখি, যেমন পেলিক্যান, দেখার সুযোগ মেলে। সুন্দরবন অঞ্চলে বর্তমানে একাধিক অভয়ারণ্য রয়েছে— লেথিয়ান দ্বীপ, হ্যালিডে দ্বীপ ও সজনেখালি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প চালু হওয়ার পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ করা গেলে কিংবা পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন উপযোগী উদ্ভিদ রোপণ সম্ভব হলে, পাখিদের খাদ্য ও নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করা যেতে পারে। তাতে দেশীয় ও পরিযায়ী নানা প্রজাতির পাখি সেখানে আশ্রয় নেবে এবং তাদের কলরবে সুন্দরবন আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। অথচ অতীতে এই সুন্দরবনেই বন্য মহিষ ও গণ্ডারের মতো বৃহৎ প্রাণীর বসবাস ছিল— যা আজ বাস্তবতার তুলনায় প্রায় অকল্পনীয় ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।[৯]

অবশ্য সুন্দরবন বনানী নিজেই নিজেকে রক্ষায় বিশেষ তৎপর। ভারতবর্ষের অন্যান্য জঙ্গলের তুলনায় এই বন ভিন্ন। মানুষের এখানে 'সহজ প্রবেশাধিকার' নেই। জলে জলজ প্রাণী, স্থলে ভয়ঙ্কর মানুষখেকো বাঘ, এমনকি সুন্দরবনের 'শুলো'— যা আরও ভয়ঙ্কর। এখানকার গাছেরা মাটির নীচ থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। ফলত গাছের শেকড় উপর দিকে গজিয়ে উঠে সূচলো হয়ে থাকে। তাই অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলতে হয়। এইভাবেই সুন্দরবন নিজেকে নাগরিক সভ্যতা থেকে খানিকটা বাঁচিয়ে রেখেছিল; কিন্তু সর্বগ্রাসী মানুষের বুদ্ধির কাছে পেরে ওঠেনি।

> "এ-হেন নোনা-বাদা মানুষকে সব ঋতুতে বরদাস্ত করতে পারে না, তাই তার দ্বার ছয়মাস থাকে রুদ্ধ। তবু অসীম সাহসী মানুষ অতীতের কোন এক সময় এই বন্য-বাদাকে জয় করার জন্য বসতি স্থাপনের দুঃসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে প্রয়াস ছিল খেয়ালী প্রকৃতির কাছে নেতাত-ই অকিঞ্চিৎকর।"[১০]

লেখক সুন্দরবনকে সময়ের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত সুন্দরবন মানব সভ্যতার অত্যাচার সহ্য করে। কারণ এই সময়টা সুন্দরবনের জীবিকা নির্ভরকারী মানুষদের সময়। এই সময় কাঠুরের দল, জেলের দল, মধু সংগ্রহকারীরা সুন্দরবনে প্রবেশ করে জীবিকার প্রয়োজনে।[১১] মানুষের উপস্থিতি ও প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতা প্রতিফলিত হয়েছে যেভাবে- মরশুমি কাজ শুরু হলেই বাদার মানুষের জীবনযাত্রায় নতুন গতি আসে। প্রায় ছয় মাস ধরে তারা হয়ে ওঠে কর্মচঞ্চল ও ব্যস্ত। এই পরিবর্তনের প্রভাব শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না— বনের প্রাণীজগতেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। যেন দীর্ঘ নিস্তব্ধতার পর বাদা অঞ্চলের বন আবার জেগে ওঠে। কাদায় গা ভিজিয়ে অলসভাবে পড়ে থাকা কুমীর জলে নেমে পড়ে, হরিণেরা অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে চারপাশের গন্ধ শোঁকে ও কান খাড়া করে শব্দ শোনে। বনের সবচেয়ে পুরোনো বাসিন্দা— বানরের দল গাছের ডালে দোল খেতে খেতে কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে অসতর্ক হরিণদের সাবধান করে দেয়, ঠিক যেন অভিজ্ঞ প্রহরীর মতো। সেইসঙ্গে মানুষের কণ্ঠস্বর আবার ছড়িয়ে পড়ে বনজুড়ে, আর সেই শব্দেই সাড়া পড়ে হেঁতাল ও গোলপাতার জঙ্গলে।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনিতে দেখা যায়, সুন্দরবন কেন্দ্রিক শ্রমজীবী মানুষের কাছে 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' মোটেও সুখকর ছিল না। এমনকি তারা এই প্রকল্পের সমর্থনও করেনি। কারণ তারা মনে করে সুন্দরবনের বাঘ মাত্রই মানুষখেকো। কাহিনিকার জানান, 'বাঘ্র প্রকল্প' প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বেই তথা ১৯৭২ সালের শিকার আইনের কারণে সুন্দরবনের এমন অনেক ভয়ঙ্কর মানুষখেকো বাঘকে হত্যা করা যায়নি, যারা পরবর্তী সময়ে অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষকে হত্যা করেছিল। এমনই ভয়ঙ্কর মানুষখেকো কুশো, জটাধারী নামক বাঘেরা দীর্ঘদিন জীবিত ছিল। তারা বৃহৎ এলাকা জুড়ে ভয়ঙ্কর ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। এই প্রসঙ্গে লেখক বলেন-

> "১৯৭০-৭১ সাল পর্যন্ত আমি জানি জটাধারী বেঁচে আছে। তারপর তো শিকার বন্ধ হয়েছে, প্রকল্প চালু হয়েছে। আশা করি নতুন প্রকল্পে জটাধারী ও কুশোর একটা সুবন্দোবস্ত করতে পারে।"[১২]

তিন

সুন্দরবনকে পটভূমি রেখে যাঁরা সাহিত্য নির্মাণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে শিবশঙ্কর মিত্র অন্যতম তো বটেই সেইসঙ্গে একবিংশ শতাব্দীর সুন্দরবন কেন্দ্রিক লেখকদের মাইলফলক তিনি। তাঁর 'বনের চোরের উপর শহরের বাটপাড়ি' গল্পে দেখা যায়, সুন্দরবনের মায়াদ্বীপে পাঁজজন স্থানীয় শ্রমজীবী মিলে শিকারে যায়। তখনও শিকার আইন অনুযায়ী অনুমতিপত্র নিয়ে শিকার করা যেত। তবে উল্লেখিত শিকারি দল বিনা

অনুমতিতেই হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে যায়। বন্য-সম্পদ আহরণে তাদের অধিকার রয়েছে, এরূপ ভাবনা থেকে তারা আইনে পালন করে না। এই প্রসঙ্গে উঠে আসে বাঘ প্রকল্পের কথা, যেখানে বলা হয়-

> "ব্যাঘ্র-প্রকল্প তখনও চালু হয়নি। বাঘ বা হরিণ মারতে কোনও বাধা তখন ছিল না, তবে সরকারি অনুমতি নিতে হতো। কিন্তু সুন্দরবনের মানুষেরা অতো অনুমতির ধার ধারে না। ওরা ভালোভাবেই জানে কি করে এই আইন এড়িয়ে কার্যসিদ্ধি করা যায়। এ নিয়ে অবশ্য ওদের কোনও মাথাব্যাথা নেই; কেননা ওরা মনে করে, বনের সম্পদে বনের উপকূলবাসীদেরই স্বাভাবিক অধিকার।"[১৩]

প্রসঙ্গত, সুন্দরবন উপকূলবর্তী মানুষের জীবনকথাকে কেন্দ্র করে শিবশঙ্কর মিত্র রচিত 'সুন্দরবন সমগ্র' গ্রন্থে বনবিভাগের অনুমতি ব্যতিরেক তথা বনবিভাগকে ফাঁকি দিয়ে শিকারে লিপ্ত স্থানীয় শিকারিদের প্রসঙ্গে কোথাও কোথাও 'চোরা শিকারি' কিংবা 'অবৈধ শিকার' শব্দবন্ধের ব্যবহার দেখা গেলেও, সেইসমস্ত ভূমিপুত্র অরণ্য অধিবাসীদের অপরাধীসত্তা চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়নি। কারণ উক্ত শব্দবন্ধের দ্বারা অপরাধ মূলক কাজকে বোঝায়। কিন্তু অরণ্যভূমিপুত্র যখনই বনের সম্পদ আহরণ করতে যায় অথবা শিকারে যায় তখন সেটাকে অবৈধ বলা যায় না। তারা নিজেরাও বিনা অনুমতি পত্রে শিকারের বিষয়কে গর্হিতের চোখে দেখে না। কারণ তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির সহায়ক হিসেবে তারা শিকার কার্যকেই মান্য করে। তাই এখনও কোনো কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো দিনে নিয়ম রক্ষার জন্য শিকার উৎসব পালিত হতে দেখা যায়।[১৪] বস্তুত, বন ও বন্যপ্রাণীকে উজাড় করে এসেছে বন ইজারাদার অথবা বাণিজ্যিক বনজ আহরণকারী সংস্থাগুলো। অরণ্য অধিবাসীরা গোপনে যে শিকার কার্যে লিপ্ত থাকে, তার মাংস অথবা অন্যান্য সামগ্রী তারা গ্রহণ করে না, করে এক শ্রেণীর উচ্চবিত্ত। যেদিন শিক্ষিত উচ্চবিত্তের এই চাহিদা শূন্য হয়ে যাবে সেদিন আর অবৈধ শিকারের প্রয়োজনই পড়বে না।

পূর্বোক্ত লেখকের 'আইরাজ' গল্পে 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' প্রসঙ্গে সুন্দরবনের এক বাউলে, সাপ প্রকল্পের কথা উত্থাপন করে বলে-

> "...আচ্ছা কর্তাসাহেব, শুনছি আপনারা কিছু দিনের মধ্যে সুন্দরবনে ব্যাঘ্র-প্রকল্প চালু করবেন। কিন্তু আপনারা কি সুন্দরবনে আইরাজ-প্রকল্প করতে পারেন না? এদের উদ্যত ফণা দেখলে হৃৎকম্প হয় বটে, কিন্তু দেখতে কি সুন্দর! বাঘের মতো এরাও তো বনের রক্ষক, তাই না!"[১৫]

যে আইরাজ সাপকে সে কিছুক্ষণ আগেই হত্যা করে, আবার তার উদ্দেশ্যেই প্রণাম করে বাউলে। এখানেই অরণ্য ভূমিপুত্র শিকারি ও শখের শহুরে শিকারির মধ্যে পার্থক্য। যেখানে এক সময়কার ব্রিটিশ শিকারিদল অথবা ভারতীয় উচ্চবিত্ত রাজা-মহারাজারা ও আরও পরে এসে একশ্রেণীর শখের বাবু শিকারিদল মৃত শিকারের উপর পা তুলে বীরত্বের ছবি তোলে, অন্যদিকে ভূমিপুত্র শিকারিরা মৃত বন্যপ্রাণের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়। যাইহোক, এই গল্পে পাওয়া যায় 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' প্রবর্তন হওয়ার পূর্বে সুন্দরবনের বাঘ শিকারের জন্য অনুমতিপত্র পাওয়া যেত। বনকর অফিস থেকে সেই অনুমতি নিয়ে বাঘ হত্যা করা যেত। কিন্তু বাঘ প্রকল্প চালু হওয়ার পর পুরোপুরি বাঘ শিকার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সেইসঙ্গে বাঘ সংরক্ষণে জোর দেওয়া হয়।

লেখকের 'বীরাঙ্গনা, না সুন্দরবনের মা!' গল্পে বাঘ প্রকল্প সম্পর্কে বলা হয়-

> "কিন্তু গত বারো বছর ধরে ব্যাঘ্র-পরিকল্পের দৌলতে ওদের সংখ্যা এমন দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কাজেই খাদ্যের তাগিদে নদী-খাল পার হয়ে মাঝে মাঝে ঢুঁ মারতে হচ্ছে আবাদে, মানুষের রাজ্যে।"[১৬]

অর্থাৎ জঙ্গলে স্বাভাবিক খাদ্যের ঘাটতির জন্য বাঘ লোকালয়মুখী হতে বাধ্য হয়। লেখকের 'সুন্দরবনের সততা' নামক গল্পে মধু সংগ্রহকারী মনসুরকে বাঘে নিলে, ব্যাঘ্র প্রকল্প নিয়ম অনুসারে তার সঙ্গীরা বনকর অফিসে মৃতের নাম নথিভুক্ত করে। অবশ্য- "...এমন ঘটনায় ব্যাঘ্র-প্রকল্পে জানানও আইন মোতাবেক বাধ্যবাধকতা আছে।"[১৭] যেহেতু মনসুর বাঘের কবলে মারা গিয়েছিল সেহেতু তার পরিবার পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছিল সরকারি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ। 'সুন্দরবনের ছাটা-বাড়ি লাঠি' গল্পে লেখক জানিয়েছন, ব্যাঘ্র প্রকল্প প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব থেকেই বিনা অনুমতিতে বাঘ মারা নিষেধ ছিল। মধু সংগ্রহকারী দল একটি বাঘকে পিটিয়ে হত্যা করে তার শরীরের বিভিন্ন অংশ সংগ্রহ করতে থাকে কারণ সেগুলি মোটা দামে বিক্রি হবে। সেইসঙ্গে আরও কিছু অংশ গ্রামীণ মানুষের দৈবিক কাজে ব্যবহৃত হবে।[১৮]

শিবশঙ্কর মিত্রের উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয় কিংবদন্তি চরিত্র বেদে-এর জীবনসংগ্রাম চিত্রিত হয়েছে 'বেদে বাউলে' উপন্যাসে। কাহিনিকার জানিয়েছেন এই কাহিনির পটভূমি যে সময়ে তখনও সুন্দরবন বাঘ প্রকল্পের আওতায় আসেনি। কাহিনি অবলম্বনে জানা যায়, বনকর অফিস থেকে যে পেট্রোলবোট নিয়ে অফিসারদের বন পাহারা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, তারা খুব যে আইনরক্ষক ছিল তা বলা যায় না। স্থানীয় অধিবাসীরা গোপনে নির্দিধায় শিকার কার্য চালাত-

> "তখনও 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' হয়নি। লোকে বনে আসে, দু-একটা হরিণ মারে। সুন্দরবনে বাঘ মারতে আসা বলা বাতুলতা। বনকর অফিসের পেট্রোলবোট বা পিটেলবোট বন পাহারা দেয় বটে, কিন্তু চোরা শিকারীকে ধরে সদরে চালান দেওয়া তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ধরতে পারলে বা ধরার মতো অবস্থা বাগাতে পারলে, কিছু পয়সা, না হয় কিছু মানুষের ভাগ নেওয়া আর কিছু নকল শাসানি ও ধমকানির পালা। কাজ দেখানোর জন্য মাঝে-মধ্যে দু-একজনকে সদরে চালান দিতে হয়।"[১৯]

চার

বুদ্ধদেব গুহের 'বনবিবির বনে' উপন্যাসের স্থানীয় শ্রমজীবী শাজাহান বলে-

> "আবার শুনছি নাকি মামা-সকলের বংশবিরিদ্ধির নিমিত্তই সোঁদরবনে বাগ-প্রকল্প কইরবেন উনারা। মজা মন্দ লয়। মামায় খেইয়ে খেইয়ে আমাদের বংশ-লাশ হবার উপক্রম, আর কর্তারা সব লাকি মামাদিগের বংশবিরিদ্ধির কাজে নেইগেচেন।"[২০]

এই প্রসঙ্গে কাহিনির প্রধান চরিত্র ঋজুদা জানায় 'চোরা শিকারি'দের কারণে বাঘের স্বাভাবিক খাদ্য যেমন হরিণ প্রভৃতি প্রাণীর সংখ্যা অত্যাধিক হ্রাস পাওয়ায় বাঘ আরও বেশি করে মানুষ হত্যায় রত হয়েছিল।[২১] এর পরিপ্রেক্ষিতে শাজাহান জানায় সুন্দরবনের বাঘ ভারতবর্ষের অন্যান্য অরণ্যের বাঘের তুলনায় স্বভাবে ভিন্ন। সুন্দরবনের বাঘ বরাবরই মানুষখেকো, এর সঙ্গে হরিণ নিশ্চিহ্ন হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। সে বলে-

> "কবে মামায় মানুষ খেইত্যো না শুনি। আমি তো জন্ম থিকেই শুনে আসিতেচি, দেইখ্যে আসিতিচি যে, মামায় মানুষ নিতেচে পতিবছর। তোমারা শেষে সোঁদরবনের বাঘের মাস্টার হইয়েছ, আমরা গরিব-গুরবো মুক্কু-সুক্কু মানুষ হয়ে কী আর বলি? বলার লাই কিছু।"[২২]

অর্থাৎ বাঘ সংরক্ষণে খুশি নয় সুন্দরবনের শ্রমজীবী শাজাহানরা। যে মানুষখেকো বাঘের হাতে তাদেরই পূর্বপুরুষদের প্রাণ গিয়েছে, সেই বাঘ সংরক্ষণ ও বংশ বৃদ্ধিতে স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত প্রকাশ করেছে তারা।

পাঁচ

বাঘ মাংসাশী প্রাণী। তার প্রধান খাদ্য হল হরিণ, বুনো শূকর, সাম্বর, চিতল প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণী। এই তৃণভোজী প্রাণীগুলি বেঁচে থাকার জন্য সম্পূর্ণভাবে অরণ্যের গাছপালা, ঘাস ও প্রাকৃতিক উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। অরণ্যের গাছ কেটে দেওয়া হলে বা বনভূমি ধ্বংস হলে প্রথম আঘাতটি পড়ে এই তৃণভোজী প্রাণীদের জীবন-আবাসস্থানের ওপর। খাদ্যের অভাবে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে, রোগাক্রান্ত হয়, অনেক ক্ষেত্রে মারা যায় বা বন ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। আর এইভাবে তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা কমে গেলে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে বাঘের ওপর। কারণ খাদ্যের অভাবে বাঘের স্বাভাবিক জীবনচক্র ব্যাহত হয়। পর্যাপ্ত শিকার না পেলে বাঘ দীর্ঘদিন অনাহারে থাকে, দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বেঁচে থাকার জন্য বিকল্প পথ খুঁজতে বাধ্য হয়। আর তখনই বাঘ লোকালয়মুখী হতে শুরু করে। লোকালয়ে প্রবেশের ফলে বাঘের সঙ্গে মানুষের সংঘাত বাড়ে। আর এই সংঘাত নাগরিক মানুষের সঙ্গে নয়, কেবল বনাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ এই ভয়ঙ্কর ত্রাসের শিকার হয়। অনেক সময় গবাদি পশু বাঘের সহজ শিকারে পরিণত হয়, আবার চরম অবস্থায় বাঘ মানুষের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। এইভাবে খাদ্যসংকট ও বাসস্থান ধ্বংসের ফলেই কিছু বাঘ ধীরে ধীরে নরখাদক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এটি বাঘের স্বভাবগত অপরাধ নয়; বরং মানুষের হাতে সৃষ্ট পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার ফল। অতএব, বাঘ সংরক্ষণ কেবল বাঘকে রক্ষা করার বিষয় নয়। এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত রয়েছে অরণ্য সংরক্ষণ, তৃণভোজী প্রাণীর সুরক্ষা এবং সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখা। গাছ কাটা ও বন ধ্বংসের ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে বাঘ–মানুষ সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে। অথচ রাষ্ট্র একদিকে বাঘ সংরক্ষণের ওপর জোর দেয় আর অন্যদিকে বড় বড় ইজারাদারদের গাছ কাটার পারমিট দেয়।

কলকাতার বিখ্যাত শিকারি রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় বাঘ বিপন্নতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন-

> "বাঘ অবলুপ্তির চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। সেই মোগল আমল থেকে শুরু হয়েছে বাঘ মারা। যে নিধন এখনও চলছে চোরাপথে। আমার বাঘ মারবার ইতিহাস ১৯৭০ সালের আগে। তখনও ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট হয়নি। আমরা বাঘ মেরেছি, লেপার্ড মেরেছি পারমিট নিয়ে এবং সরকারকে উপযুক্ত রয়্যালটি দিয়ে। আজ সারা বিশ্ব জুড়ে বাঘ বাঁচাও প্রকল্প চলছে। যদি সাফল্য আসে, কিছু বাঘ আর লেপার্ড হয়তো বাঁচবে। সেই সুদিনের প্রার্থনা করছি।"[২৩]

পরিবেশ রক্ষায় 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' অবশ্যই একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। অরণ্য অধিবাসীদের একাংশ বাঘ প্রকল্পের সমর্থন করলেও, বৃহৎ অংশ এই প্রকল্পকে তাদের জীবিকা ও নিরাপত্তার পরিপন্থী বলে মনে করেছে। বাঘ সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ যতটা সক্রিয়, অরণ্যনির্ভর শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকার সুরক্ষায় সেই উদ্যোগ ততটাই অপর্যাপ্ত। মানুষখেকো বাঘের আক্রমণে প্রাণহানি, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের অনিশ্চয়তা এবং বন ব্যবহারে ক্রমবর্ধমান বিধিনিষেধ— সব মিলিয়ে এই প্রকল্প অনেক ক্ষেত্রে বনাঞ্চলের মানুষের কাছে ভয়ের ও বঞ্চনার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ফলে বাঘ সংরক্ষণ আর মানবসুরক্ষা— এই দুইয়ের মধ্যে যে ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন, তা বাস্তবে কার্যকর হয়নি। বাঘ সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির প্রশ্নে রাষ্ট্রের সক্রিয়তা যতটা দৃশ্যমান, বনাঞ্চলের মানুষের জীবনরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সেই সক্রিয়তা ততটাই অনুপস্থিত— এই অসাম্য সাহিত্যিক উপস্থাপনায় গভীরভাবে উন্মোচিত হয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অরণ্য ও শিকারকেন্দ্রিক আখ্যানগুলো এই দ্বন্দ্বকে নিছক নীতিগত বিতর্ক হিসেবে নয়, বরং অরণ্য অধিবাসী ও শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন ভয়, ক্ষতি ও অসহায়তার কথা প্রকাশ করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. National Tiger Conservation Authority. 'FAQs.' NTCA, Government of India, https://ntca.gov.in/faqs/. Accessed 14 Jan. 2026.

২. Singh, Chitra. Project Tiger: A Conservation Program for Saving the Indian Tiger. 'International Journal of Research in All Subjects in Multi Languages (IJRSML)'. vol. 5, no. 12, Dec. 2017.

৩. Groom, Martha J., Gary K. Meffe, and C. Ronald Carroll. Principles of Conservation Biology. 3rd ed., Sinauer Associates, 2005.

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। অবিশ্বাস্য অভিযান। ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩: দে'জ পাবলিশিং। সুধাংশুশেখর দে (প্রকাশক)। পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল, ২০১৭। পৃ. ১১।

৫. তদেব, পৃ. ৫১।

৬. তদেব, পৃ. ২৪।

৭. তদেব, পৃ. ৭৪।

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। সুন্দরবনের আতঙ্ক। ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩: দে'জ পাবলিশিং। সুধাংশুশেখর দে (প্রকাশক)। পুনর্মুদ্রণ, জুন, ২০১৭। পৃ. ১০।

৯. তদেব, পৃ. ১৪।

১০. তদেব, পৃ. ১৪।

১১. তদেব, পৃ. ১৫।

১২. তদেব, পৃ. ৫৪।

১৩. মিত্র, শিবশঙ্কর। সুন্দরবন সমগ্র। ৯৫, শরৎ বোস রোড, কলকাতা, ৭০০০২৬: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দ্বাদশ মুদ্রণ, জুলাই, ২০২২। পৃ. ৪৪২।

১৪. বসাক, অভিজিৎ। দুঃশ্চিন্তায় বন্যপ্রাণপ্রেমীরা! চৈত্র সংক্রান্তিতে আবার শিকার উৎসব। 'Aaj Tak বাংলা', 09 Apr. 2021। https://bangla.aajtak.in/west-bengal/story/hunting-festival-west-bengal-big-worry-administration-and-animal-lovers-272592-2021-04-09. Accessed 17 Jan. 2026.

১৫. মিত্র, শিবশঙ্কর। সুন্দরবন সমগ্র। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৪১।

১৬. তদেব, পৃ. ৪৪৮।

১৭. তদেব, পৃ. ৪৩৫।

১৮. তদেব, পৃ. ৪২৩।

১৯. তদেব, পৃ. ৫২।

২০. গুহ, বুদ্ধদেব। বনবিবির বনে। ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, ৭০০০০৯: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। সুবীরকুমার মিত্র (প্রকাশক)। নমব মুদ্রণ, এপ্রিল, ২০১৯। পৃ. ৫৬।

২১. তদেব, পৃ. ৫৬।

২২. তদেব, পৃ. ৫৬।

২৩. চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ। আজমলমারির নরখাদক। ৩/১, কলেজ রো, কলকাতা, ৭০০০০৯: পত্রভারতী। ত্রিবিদকুমার চট্টোপাধ্যায় (প্রকাশক)। প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৯। পৃ. ভূমিকা।

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ:

১. Government of India, Ministry of Environment & Forests. 'Compendium of Guidelines & Circulars Issued by the Director (Project Tiger)'. Project Tiger Directorate, Nov. 2004.

২. Government of India, Ministry of Environment and Forests. 'India Tiger Estimate 2010'. Mar. 2011.

৩. Jhala, Y.V., Qureshi, Q. and Nayak, A.K. (eds). 'Status of Tigers, Copredators and Prey in India, 2018'. National Tiger Conservation Authority, Government of India, and Wildlife Institute of India, 2020.

৪. ভট্টাচার্য্য, শীলাঞ্জন। গ্রাম বাংলার বন্য জন্তু (স্তন্যপায়ী)। পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদ। দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৩।

৫. সেনগুপ্ত, সুধীন। সুন্দরবন: জীব পরিমণ্ডল। আনন্দ পাবলিশার্স। তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৫।